# Living the Lotus 9

## Buddhism in Everyday Life

2026
VOL. 252

২৫ আগস্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই তাইপেই ধর্মকেন্দ্রে 'ওবোন উৎসব (পূর্বপুরুষ বন্দনা) ও দুই দিনব্যাপী 'ত্রিখন্ডিত সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের পাঠ ও পুণ্যোৎসর্গ' যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়।

**Living the Lotus**
**Vol. 252 (September 2026)**

Senior Editor: Rev. Takashi Maeda
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

*Living the Lotus* is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই। বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা～দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

# প্রত্যেকে একটি করে প্রদীপ জ্বালাই

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্সো কোসেই-কাই।

কাজিকাজাওয়া ধর্মকেন্দ্রে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠিত 'প্রেসিডেন্টের সংযোগ সমাবেশ'-এ সম্মানিত প্রেসিডেন্ট একটি বনসাই পাইন গাছে বালি ভরাট করছেন। এই বনসাই গাছটি পুরনো ধর্মকেন্দ্রে প্রেসিডেন্টের নিজ হাতে রোপন করা পাইনগাছের ডাল থেকে কলম করে তৈরী করা হয়েছে। (এই বছরের জুন মাসে, ইয়ামানাসি প্রদেশের ফুজিকাওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামে)

## অন্ধকারের জন্য বিলাপ নয়

আজও পৃথিবীর নানা প্রান্তে অসংখ্য মানুষ যুদ্ধ, সহিংসতা, নিপীড়ন ও অন্যায়ের শিকার হয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন। এমন এক সময়ে, রোমান ক্যাথলিক চার্চের মহামান্য চতুর্দশ পোপ লিও বিশ্বের সকল রাষ্ট্রনায়কের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন—"যুদ্ধ বন্ধ করুন এবং শান্তি ও পুনর্মিলন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।" একই সঙ্গে তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছেন—"আত্মপূজা ও অর্থপূজা বন্ধ করুন। ক্ষমতা প্রদর্শন বন্ধ করুন। জীবনের সেবায়ই প্রকৃত শক্তি প্রকাশ পায়।"

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এমন নজিরবিহীন সময়েও শান্তির এই আহ্বানের বিরুদ্ধে একটি দেশের নেতা পর্যন্ত সমালোচনার তীর ছুড়েছেন। মানুষের হৃদয় ও ভাষা—যা পারস্পরিক বোঝাপড়া, সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক মহামূল্যবান দান—সেই শক্তিই যখন সংঘাত ও অশান্তির অস্ত্র হয়ে ওঠে, তখন তা গভীর বেদনার কারণ হয়। আর আমরা অনেকেই এই বাস্তবতা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলা এবং অসহায় দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া যেন আর কিছুই করতে পারি না।

তবে, এমন এক অন্ধকার ও অনিশ্চিত সময়েও প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ অবস্থান থেকে কিছু করার আছে—এই আশাবাদী আহ্বানই উচ্চারণ করেছেন প্রখ্যাত প্রাচ্য চিন্তাবিদ ইয়াসুওকা মাসাহিরো। তাঁর সুপরিচিত বাণী—"একটি প্রদীপ একটি কোণকে আলোকিত করে; আর অসংখ্য প্রদীপের আলোয় সর্বত্র আলোকিত হয়ে ওঠে।"

"অন্ধকারের জন্য বিলাপ না করে, একটি প্রদীপ জ্বালাই।
প্রথমে নিজের চারপাশের অন্ধকার দূর করার একটি প্রদীপ হয়ে উঠি।
আলো ক্ষীণ হলেও অন্তত একটি কোণকে আলোকিত করি।
আমাদের হাত যতদূর পৌঁছায়, ততদূর পর্যন্ত একের পর এক প্রদীপ জ্বালিয়ে যাই।
একজন যদি একটি প্রদীপ জ্বালায়, তবে দশ হাজার মানুষ মিলে দশ হাজার প্রদীপ জ্বালাতে পারে।
তখন সমগ্র জাপান অচিরেই আলোর দীপ্তিতে ভরে উঠবে।
এটাই আমাদের 'একটি কোণকে আলোকিত করার সাধনা'; আর সেই সাধনাই একদিন অসংখ্য প্রদীপের আলোয় সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করবে।
আসুন, আন্তরিক নিষ্ঠা ও অটল সংকল্প নিয়ে সমাজ সংস্কারের মহৎ সাধনায় আত্মনিয়োগ করি।"

উক্ত বাণীতে ব্যবহৃত ‘জাপান’ শব্দটির পরিবর্তে ‘বিশ্ব’ শব্দটিই অধিকতর প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ বলে মনে হয়। একইভাবে, সেখানে ব্যবহৃত ‘সমাজ-সংস্কারের সাধনা’ কথাটিও কেবল বৃহৎ কোনো সামাজিক বিপ্লব বা যুগান্তকারী পরিবর্তনের আহ্বান নয়, বরং মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার এক বাস্তব জীবনচর্চার আহ্বান। যা গত মাসে আলোচিত ‘অন্যের জন্য প্রদীপ জ্বালাও’—এই বাণীরই একটি স্বাভাবিক ও গভীরতর সম্প্রসারণ।

রোমান ক্যাথলিক চার্চের মহামান্য পোপ বলেছেন, “আমাদের মধ্যে যদি সামান্যতম বিশ্বাসও থাকে, তবে আমরা সমগ্র মানবজাতির অংশ হিসেবে, মানবতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইতিহাসের এই অস্থির ও সংকটময় সময়কে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারি।” আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সৎকর্ম, সহমর্মিতা ও পরোপকারের মনোভাব যেন একটি আলোকবর্তিকার মতো, যা অন্তত একটি কোণকে আলোকিত করতে পারে। যখন কোটি কোটি মানুষ নিজ নিজ জীবনে এমন একটি করে আলোর প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন, তখন সেই অসংখ্য আলোকশিখা মিলিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করবে। সেদিন এই পৃথিবী—অসীম মহাকাশের অন্ধকারে নীলাভ জ্যোতিতে দীপ্ত এক অনন্য গ্রহে পরিণত হবে।

## যতদূর নাগাল পাই

এই বাণীর মধ্যে “যতদূর সম্ভব, সর্বত্র আলোক বর্তিকা জ্বালিয়ে দিই”—এই কথাটিকে “যতটুকু আমাদের সাধ্য ও নাগালের মধ্যে” অর্থে গ্রহণ করলে, আমাদের নিজেদের পক্ষেও সহজে করা সম্ভব এমন ছোট ছোট দান ও সেবামূলক কাজই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে আলোকিত করার আলোকবর্তিকা হয়ে উঠার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ভাবলে মনে হয়, এই মাসের ১০ তারিখে আমাদের সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা নাগানুমা মিয়োকো-এর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে পালিত ‘কৃতজ্ঞতার স্মরণসভা’-এর দিনটি আসাও হয়তো নিছক কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়।

সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা তাঁর সংস্পর্শে আসা প্রত্যেক মানুষকেই নিজের গর্ভজাত সন্তানের মতো আপন করে ভাবতেন। প্রয়োজনে কখনো কঠোর হলেও, তাঁর সেই নির্দেশনা ছিল আন্তরিকতা ও গভীর মমতায় পূর্ণ। তিনি যেন সত্যিই “সর্বত্র আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে যাওয়া”-র করুণাময় সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর সামনে কোনো মানুষকে অসহায় বা অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দেখলে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে, প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার, বিছানা, অর্থ—এমনকি সেই মুহূর্তে নিজের পরনে থাকা পোশাক পর্যন্ত অকাতরে দিয়ে দিতেন বলে জানা যায়। তিনি নিজের কাছে থাকা সবকিছুকেই “বুদ্ধের কাছ থেকে পাওয়া আশীর্বাদ” বলে মনে করতেন। এভাবেই তিনি একের পর এক মানুষের জীবনে ভালোবাসা ও করুণার আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন।

আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে “হাত যতদূর পৌঁছায়” সেই পরিসরটি দেখি, তাহলে বুঝতে পারি—সেখানে শুধু আমাদের পরিবারের মানুষই নন; আমাদের প্রতিবেশী, ট্রেন বা বাসে পাশে বসা মানুষ, এমনকি দোকানের ক্যাশ কাউন্টারের লাইনে আমাদের সামনে বা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটিও অন্তর্ভুক্ত। এই মানুষগুলোর প্রতি একটি হাসি, একটি কৃতজ্ঞতার কথা কিংবা প্রয়োজনে বিপদগ্রস্ত কারও দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াও আমাদের চারপাশকে আলোকিত করার একেকটি আলোকবর্তিকা হয়ে উঠতে পারে। পরিবারের সদস্যদের প্রতি যত্ন ও কৃতজ্ঞতার কথা যেমন ঘরকে উজ্জ্বল ও উষ্ণ করে তোলার আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে, তেমনি দূর কোনো দেশে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকা মানুষের জন্য আন্তরিক প্রার্থনাও এক মূল্যবান আলোকবর্তিকা। আর আজ, দেশ, জাতি ও ধর্মের সব ভেদাভেদ অতিক্রম করে, সারা বিশ্বের মানুষ নিশ্চয়ই একই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রার্থনা করছে—শান্তির আলোকবর্তিকা যেন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

“অন্যের জন্য জ্বালানো আলোকবর্তিকা কখনো নিভে যায় না”—শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতার এই বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করে, আসুন আমরা আমাদের হাতের নাগালের ছোট ছোট সেবামূলক কাজগুলো অক্লান্ত ও নিরলসভাবে চালিয়ে যাই।

*‘কোসেই’ সেপ্টেম্বর ২০২৬ইং*

Interview

# ‘সাধনার কোনো শেষ নেই’ এই চেতনায়, নতুন উদ্যমে প্রতিদিনের পথ চলা।

## মিস্ নাওমি মাসুনো, রিস্‌সো কোসেই-কাই লস অ্যাঞ্জেলেস।

**কখন এবং কীভাবে আপনি প্রথম রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর ধর্মবিশ্বাসের সংস্পর্শে এলেন?**

আমি ওসাকায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং সেখানেই বড় হয়েছি। ১৯৮০ সালে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর যে পরিবারে আমি এসেছিলাম, সেটি ছিল রিস্‌সো কোসেই-কাই -এর ওসাকা ধর্মকেন্দ্রের একজন সদস্যের পরিবার। এভাবেই এই ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। আমার স্বামী এবং তাঁর বাবা-মা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সদস্য। তাই আমাদের বাড়িতে দিন-রাত স্থানীয় সদস্য ও যুব বিভাগের নেতৃবৃন্দের আসা-যাওয়া লেগেই থাকত।

বিয়ের পরের বছর, ১৯৮১ সালে, আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকের শেষদিকে জাপানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সময়ে আমার স্বামী উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। তিনি প্রায় প্রতিরাতেই বাড়ির বাইরে থাকতেন অথবা ভোররাতে বাড়ি ফিরতেন। ফলে ধীরে ধীরে আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। পরিবারের প্রতি স্বামীর উদাসীনতা দেখে একসময় আমার মনে হতে লাগল—“এভাবে আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। সম্ভব হলে আমি বিবাহবিচ্ছেদ করতে চাই...” শেষ পর্যন্ত কিছু সময়ের জন্য আমি আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিই।

আমার এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে এলাকার দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ প্রায়ই আমার খোঁজখবর নিতেন এবং আমাকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করতেন। প্রথমদিকে আমি তাঁদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সময় বাড়িতে থেকেও এমন ভান করতাম যেন আমি বাড়িতে নেই। কিন্তু আমার সহধর্মবিশ্বাসী সঙ্গীরা বারবার আমার বাসায় এসে আমার খোঁজ নিতে থাকেন। তাঁদের সেই আন্তরিকতা, মমতা ও সহানুভূতি ধীরে ধীরে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে। এরপর আমি আমার ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে অল্প অল্প করে ওসাকা ধর্মকেন্দ্রে যেতে শুরু করি।

ধর্মকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন—“ইদানীং কেমন আছেন? কোনো কিছু কি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে?” “কিছু ঘটলে আমাদের বলতে কোনো দ্বিধা করবেন না।” তাঁরা শুধু আমার খোঁজখবরই নিতেন না, আমার ছোট ছেলেটিরও যত্ন নিতেন এবং তাকে দেখাশোনা করতে আমাকে সহযোগিতা করতেন। তাঁদের এই আন্তরিক সহায়তা ও উষ্ণতার জন্যই আমি ধীরে ধীরে প্রয়াত স্বজনের স্মরণ-অনুষ্ঠানে এবং ধর্মকেন্দ্রের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সাধনায় অংশ নিতে শুরু করি।

**আপনার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে সঙ্ঘের সদস্যরা আপনাকে আন্তরিকভাবে পাশে থেকে সহযোগিতা করেছিলেন, তাই তো?**

এরপরও আমি আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি। বেশ কয়েকবার বিবাহবিচ্ছেদের কাগজপত্র নিয়ে গেলেও, প্রতিবারই তিনি সেগুলো ছিঁড়ে ফেলতেন। আমি দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছিলাম এবং কী করব, তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই আমাদের দাম্পত্য জীবনের সমস্যা নিয়ে তৎকালীন শাখা-প্রধানের কাছে মন খুলে কথা বললাম। তিনি আমাকে দৃঢ় অথচ মমতাপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, “আপনার স্বামীর সঙ্গে যে সমস্যার মধ্য দিয়ে আপনি যাচ্ছেন, সেটিও আপনার জন্য প্রয়োজনীয় একটি সাধনা। বিবাহবিচ্ছেদ করা হয়তো সহজ,

*মিস্ নাওমি মাসুনো*

কিন্তু আপনার নিজের মনের পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতে আবার একই ধরনের কষ্টের সম্মুখীন হতে পারেন। বিবাহবিচ্ছেদ হবে কি না, সেই সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধের ওপর ছেড়ে দিন। আপাতত শুধু একাগ্রচিত্তে ধর্মানুশীলন করে চলুন।” আমি তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এরপর আন্তরিকভাবে সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ধর্মের কথা বলা এবং হোজা বা ধর্মবৈঠকের সাধনা করতে করতে নিজের মনের গভীরে ও সততার সঙ্গে তাকাতে শুরু করলাম। এর কিছুদিন পর আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা ঘটল। দীর্ঘদিন ধরে যিনি জেদ করে বিবাহবিচ্ছেদে রাজি হচ্ছিলেন না, সেই আমার স্বামী হঠাৎ সহজেই বিবাহবিচ্ছেদের কাগজে স্বাক্ষর করে দিলেন। আমরা এই শর্তে সম্মত হলাম যে, আমাদের ছেলের একক অভিভাবকত্ব আমার কাছে থাকবে এবং কোনো ভরণপোষণ বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে না। অবশেষে ১৯৯১ সালে আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন হয় এবং আমরা দুজনেই জীবনের নতুন অধ্যায়ের পথে এগিয়ে যাই।

এরপর একা হাতে আমার ছেলেকে বড় করতে গিয়ে আর্থিক সংকটসহ আরও অনেক কঠিন ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। একজন মা হিসেবে নিজের সন্তানকে রক্ষা করে বড় করে তোলার দৃঢ় সংকল্প ও শক্তি আমার মধ্যে ছিল। তবুও এমন অনেক সময় এসেছে, যখন মনে হয়েছে আমি হয়তো আর সামলাতে পারব না, ভেঙে পড়ব। যখনই এমন পরিস্থিতি এসেছে, সঙ্ঘের সদস্যরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং আন্তরিকভাবে আমার পাশে থেকেছেন। এত মানুষের ভালোবাসা ও সহযোগিতা ছিল বলেই, ছেলেকে মানুষ করার পাশাপাশি আমি দিনের

বেলা একটি জীবনবীমা কোম্পানিতে কাজ করতে পেরেছি এবং সন্ধ্যায় শাখার যুব মহিলা বিভাগের প্রধান হিসেবে সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর সাধনা চালিয়ে যেতে পেরেছি। এছাড়াও ওমে প্রশিক্ষণ শিবির এবং শিচিমেন পর্বতে তীর্থযাত্রায় অংশ নিয়েছি এবং আন্তরিকভাবে যুব বিভাগের কার্যক্রমে নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরেছি। আজ পেছন ফিরে তাকালে, আমার হৃদয় গভীর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। আমার ছেলে ছোটবেলা থেকেই বুদ্ধের সান্নিধ্যে বেড়ে উঠেছে এবং আজ সে একজন সরল, আন্তরিক ও মমতাপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছে—এর জন্য আমি অন্তর থেকে কৃতজ্ঞ।

**এরপর আপনি কীভাবে শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে এলেন, সে সম্পর্কে আমাদের বলবেন?**

১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, বিবাহবিচ্ছেদের পরের বছর, আমি স্কুলজীবনের এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে আমেরিকার লাস ভেগাসে গিয়েছিলাম। সেখানেই যেন ভাগ্যের নির্দেশে, এমন এক সময়ে আমার বর্তমান স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সেই সময় তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করতেন এবং লাস ভেগাসে পর্যটকদের গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আমরা তাঁকে বলেছিলাম যে জাপান থেকে বেড়াতে লাস ভেগাসে এসেছি। তখন তিনি আমাদের তাঁর প্রায়ই যাওয়া একটি রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলেন। প্রথম দেখাতেই আমাদের বেশ ভালোভাবে কথা জমে গেল। আমরা আনন্দের সঙ্গে একসঙ্গে খাবার খেলাম এবং তারপর বিদায় নিলাম।

কিন্তু তার মাত্র তিন দিন পর আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে ঘটনাটি আমার কাছে কোনো সিনেমা বা উপন্যাসের কাহিনির মতো মনে হয়েছিল। এতটাই আশ্চর্যজনক সেই কাকতালীয় সাক্ষাৎ ছিল যে, আমার মনে গভীর এক নিয়তির টান অনুভূত হয়েছিল। সেদিনও আমরা একসঙ্গে খাবার খেলাম। বিদায় নেওয়ার সময় আমি তাঁকে আমার ফোন নম্বর দিয়ে বললাম, "কখনো যদি ওসাকায় আসার সুযোগ হয়, তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।" এরপর আমার বন্ধু এবং আমি পরের দিন জাপানে ফিরে এলাম।

*পরিবারের সাথে: স্বামী (উপরে বামে), ছেলে (নিচে বামে), নাতনি (উপরে ডানে)*

*১৯৯৬ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস ধর্মকেন্দ্রের সদস্যদের সঙ্গে অ্যারিজোনা কেন্দ্রে পবিত্র বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। (সামনের সারিতে ডানদিকে মিস্ মাসুনো।*

প্রায় ছয় মাস পর সত্যিই তিনি কাজের সূত্রে ওসাকায় এলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার এক আবেগঘন পুনর্মিলন হলো। এভাবেই একের পর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমাদের জীবনের গো-এন—এক বিশেষ নিয়তির বন্ধনে পরিণত হলো। আমাদের দুজনেরই আগে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল এবং তখন আমরা দুজনেই অবিবাহিত ছিলাম। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হওয়ার পর, ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে আমরা পুনর্বিবাহ করি।

তিনি যখন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তখন আমি আমার মনের কথা অকপটে তাঁকে জানিয়েছিলাম—"বিয়ের পরেও আমি রিস্সো কোসেই-কাই-এর ধর্মবিশ্বাস ও সাধনা চালিয়ে যাব। আর আমার কাছে যে ছেলে অমূল্য, সেও আমার সঙ্গে থাকবে।"

তিনি একসময় টোকিওর সুগিনামি এলাকায় বসবাস করেছিলেন। তাই রিস্সো কোসেই-কাই-এর মূলমন্দির সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল। এছাড়া তাঁর বাবা-মা দুজনেই ইতিমধ্যে প্রয়াত হয়েছিলেন। তাই আমেরিকাতেও পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও তাঁদের জন্য ধর্মীয় সাধনা করা সম্ভব হবে—এই বিষয়টিও তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে তিনি আমার রিস্সো কোসেই-কাই-এর ধর্মবিশ্বাস ও সাধনা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাকে আন্তরিকভাবে সম্মান করেছিলেন। অবশ্য আমার ছেলেকেও তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে ১৯৯৪ সালের মে মাসে, তখন জুনিয়র হাই স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমাই।

**লস অ্যাঞ্জেলেস ধর্মকেন্দ্রে আপনি জাপানি-ভাষী শাখার শাখা-প্রধানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন, তাই তো?**

২০০৩ সাল থেকে আমি শুনিন ও মহিলা বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব একসঙ্গে পালন করার সুযোগ পেয়েছি। এরপর ২০০৭ সাল থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে জাপানি-ভাষী শাখার শাখা-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। আমি যখন প্রথম আমেরিকায় আসি, তখন এখানকার ভিন্ন সংস্কৃতি ও রীতিনীতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়েছি। এমনকি রিস্সো কোসেই-কাই-এর সাধনার ক্ষেত্রেও জাপান ও আমেরিকার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য অনুভব করেছি। জাপানে সাধারণত পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই, উদাহরণস্বরূপ, কোনো নেতার কাছ থেকে নির্দেশনা পেলে অনেকেই স্বাভাবিকভাবেই বলেন, "জি, বুঝতে পেরেছি" অথবা "হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।" অন্যদিকে, আমেরিকায় সাধারণভাবে মানুষ নিজের মতামত ও ইচ্ছাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে অভ্যস্ত। যেমন, তাঁরা বলেন, "আমি এভাবে মনে করি" অথবা "আমি বিষয়টিকে এভাবে দেখি।"তবে এর কোনোটিই

# Interview

ভালো বা খারাপ—এভাবে বিচার করার বিষয় নয়। বরং আমেরিকান সদস্যদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি যে, প্রতিটি দেশের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা পরস্পরের পক্ষ থেকে স্বীকার করা, সম্মান করা এবং বোঝার চেষ্টা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে আমি যে পাম স্প্রিংস্ এলাকায় থাকি, সেখান থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস ধর্মকেন্দ্র প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে। গাড়িতে যেতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগে। তরুণ বয়সে আমি একদিনেই গিয়ে ধর্মকেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করে আবার বাড়ি ফিরে আসতাম। কিন্তু বর্তমানে ধর্মকেন্দ্রে রাত্রিযাপন করে প্রতি মাসের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করি।

গাড়িতে করে ধর্মকেন্দ্রে যাওয়ার পথে, আমি ধর্মকেন্দ্র থেকে দূরে বসবাসকারী এবং কোলে শিশু বা ছোট সন্তান থাকা সদস্যদেরও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যাতে তাঁরাও সাচ্ছন্দে ধর্মীয় কাজে অংশ নিতে পারেন। এভাবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আমি যেমন নিজের বিশ্বাস ও সাধনাকে আরও গভীর করার চেষ্টা করেছি, তেমনি অতীতে সঙ্ঘের সদস্যরা যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই অভিজ্ঞতাকেও মনে রেখেছি। তাই অন্য মানুষের কষ্ট ও দুঃখের সময় তাঁদের পাশে থাকা এবং আন্তরিকভাবে তাঁদের সঙ্গে পথ চলার বিষয়টিকে আমি সবসময় গুরুত্ব দিয়েছি। এইভাবেই বছরের পর বছর ধরে বহু সদস্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে তাঁদের পাশে থাকার সুযোগ পেয়েছি।

**রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর এমন কোনো বিশেষ শিক্ষা আছে কি, যা আপনি সবসময় হৃদয়ে ধারণ করে চলেন?**

"আমি নিজে পরিবর্তিত হলে, অন্য ব্যক্তিও পরিবর্তিত হন"—এই শিক্ষাটি আমি গভীরভাবে হৃদয়ে ধারণ করি। বর্তমান স্বামীর সঙ্গে বিয়ের শুরুর দিকে, অনেক সময় অজান্তেই তাঁর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে ফেলতাম, যেন আমি তাঁকে ওপর থেকে উপদেশ দিচ্ছি। তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমি তো তোমার কাছে শিখতে বলিনি।" তাঁর সেই কথায় আমি নিজের অহংকার ও আত্মম্ভরিতার দিকটি উপলব্ধি করতে পারি। আবারও গভীরভাবে অনুভব করি যে, আমার মধ্যে কতটা প্রবল 'আমিত্ব'-ভাব রয়েছে। একই সঙ্গে, এই অভিজ্ঞতা আমাকে জীবনে যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তৈরি হয় এবং যে সমস্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, সেগুলোর প্রতিটি বিষয় থেকে শিক্ষা নিয়ে, নিজেকে পরিবর্তন করে, ক্রমাগত বিকশিত করার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে।

**এই বছরের জুন মাসে আপনি জাপানি-ভাষী শাখার শাখা-প্রধানের দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন। এখন থেকে কী মনোভাব নিয়ে সাধনায় এগিয়ে যেতে চান, সে সম্পর্কে আমাদের বলবেন?**

সম্মানিত প্রেসিডেন্ট আমাদের সবসময় শিক্ষা দিয়ে আসছেন—"সাধনা, সাধনা; মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সাধনা। আর পুনর্জন্ম হলেও আবার সাধনা।"

কোনো দায়িত্ব থেকে অবসর নিলেও বুদ্ধের পথে আমাদের সাধনা তো শেষ হয়ে যায় না। তাই আমিও ভবিষ্যতে সদস্যদের প্রতিজ্ঞায় উল্লিখিত 'ব্যক্তিত্বের সাধন' এর লক্ষ্য নিয়ে প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে যেতে চাই। আমি যাঁদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেস ধর্মকেন্দ্রের সাবেক পরামর্শদাতা প্রয়াত গ্রিমিৎসু মহোদয়া। বয়সের কারণে শাখা-প্রধানের দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পরও তিনি তাঁর সমবয়সী সদস্যদের নিজের গাড়িতে করে সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং প্রতি মাসের গো-মেইনিচি উপলক্ষে অবশ্যই ধর্মকেন্দ্রে প্রার্থনা ও উপাসনায় অংশ নিতেন।

ভবিষ্যতেও আমি গ্রিমিৎসু মহোদয়াকে একজন আদর্শ বিশ্বাসী হিসেবে হৃদয়ে ধারণ করে চলতে চাই। "সাধনার কোনো শেষ নেই"—এই কথাটি মনে ধারণ করে, এখন থেকে একজন অনুসারী হিসেবে নতুন উদ্যম ও নতুন মন নিয়ে বুদ্ধের পথে সাধনা করে যেতে চাই।

*২০২৬ সালের ২৯ মার্চ রবিবারের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে রিস্‌সো কোসেই-কাই আন্তর্জাতিক বিভাগের পরিচালক রেভারেন্ড মায়েদাকে (সামনের সারির মাঝখানে) ঘিরে লস অ্যাঞ্জেলেস ধর্মকেন্দ্রের সদস্যরা। সামনের সারিতে বাঁ দিক থেকে চতুর্থজন হলেন মিস্ মাসুনো।*

# ধর্মানুশীলন করুন এখানে, এখনই

## সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র ও চতুরার্যসত্যের শিক্ষা

ডঃ ডমিনিক স্কারাঞ্জেলো
উপদেষ্টা, রিস্‌সো কোসেই-কাই আন্তর্জাতিক বিভাগ।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের ‘তথাগতের দৈবশক্তি অধ্যায়’-এ উল্লিখিত ‘ধর্মানুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র’ এমন এক মহৎ শিক্ষা, যা আমাদের নীরবে অনুপ্রাণিত করে যেন আমরা পরিবার, কর্মক্ষেত্র, বিদ্যালয়সহ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্থানকেই সাধনা ও ধর্মচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করি এবং সেখানে বুদ্ধের শিক্ষাকে বাস্তবে অনুশীলন করি।

### দুঃখ সমুদয় আর্যসত্যের অনুশীলন

আগের পর্বে আমরা আলোচনা করেছি, কীভাবে মাইন্ডফুলনেস—অর্থাৎ “এই মুহূর্তে, এখানে” নিজের চেতনাকে স্থির রাখা—এবং বডিফুলনেস—অর্থাৎ সমগ্র শরীরের প্রতি সচেতন থাকা—এর মাধ্যমে দুঃখ সত্যের অনুশীলন করা যায়। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার মধ্যে যখন ব্যবধান তৈরি হয় এবং সেই কারণে মনে দুঃখের উদয় হয়, তখন সেই মুহূর্তটিকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করা—এটাই ছিল সেই অনুশীলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

আমরা যদি নিজেদের দুঃখকে সততার সঙ্গে স্বীকার করতে পারি এবং মেনে নিতে পারি যে, “আমার একটি সমস্যা রয়েছে,” তাহলে বলা যায়, আমরা ইতিমধ্যেই প্রথম বড় বাধাটি অতিক্রম করেছি। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকা যায় না। বুদ্ধ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—দুঃখ থেকে মুক্ত হতে চাইলে পরবর্তী ধাপে যেতে হবে। আর সেই ধাপ হলো দুঃখের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করা। এটিই দুঃখ সমুদয় সত্য।

বৌদ্ধধর্মে কখনো বলা হয়, মানুষের তৃষ্ণা বা প্রবল আকাঙ্ক্ষা দুঃখের মূল কারণ। আবার কখনো বলা হয়, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের অবিদ্যা বা অজ্ঞতাই দুঃখের কারণ। কিন্তু এই দুটি পরস্পরবিরোধী নয়। “অবিদ্যা” বলতে শুধু কোনো বিষয় না-জানাকে বোঝায় না। এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে ভুলভাবে উপলব্ধি করা—অর্থাৎ, মনের গভীরে প্রোথিত আত্মকেন্দ্রিকতা। এই আত্মকেন্দ্রিকতা কেবল একটি চিন্তার ধরন নয়; বরং আমরা যেভাবে পৃথিবীকে দেখি ও উপলব্ধি করি, তার মধ্যেই এটি গভীরভাবে প্রোথিত থাকে। আর এই আত্মকেন্দ্রিকতা থেকেই জন্ম নেয়— “বাস্তবতাকে আমার ইচ্ছামতো হতে হবে”—এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি।

তারপর আমরা বাস্তবতাকে নিজের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করার জন্য নানা কাজ করতে থাকি। আর তার ফলেই কখনো নিজের, কখনো আশপাশের মানুষের, আবার কখনো উভয়েরই দুঃখের কারণ হয়ে উঠি।

এখানে আমার তরুণ বয়সের একটি ঘটনা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। আমি যখন বিশের কোঠায়, তখন একবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কাজে যাওয়ার জন্য গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পথে ভয়াবহ যানজটে আটকে পড়লাম। যত সময় যেতে লাগল, আমার বিরক্তি তত বাড়তে লাগল। একসময় আশপাশের প্রতিটি গাড়িকেই আমার গন্তব্যে পৌঁছানোর পথে বাধা বলে মনে হতে লাগল। ঠিক তখনই পাশের একটি গাড়ি আমার সামনে ঢুকে পড়ল। আমি মুহূর্তের মধ্যে রেগে গেলাম, হর্ন বাজালাম এবং সেই চালকের দিকে চিৎকার করে উঠলাম। সামনের চালকও চিৎকার করে জবাব দিলেন। ফলে, একটি সাধারণ যানজট—যা হয়তো কিছু সময় পর স্বাভাবিকভাবেই শেষ হয়ে যেত—আমার কাছে যেন নরকের মতো এক যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতায় পরিণত হলো।

তখন নিজেকে প্রশ্ন করলাম—“আমি কেন এমন আচরণ করলাম?” আমি যদি সেই চালকের প্রতি রাগ না দেখাতাম, চিৎকার না করতাম, তাহলে হয়তো সেই ঝগড়াটিই হতো না। এই অর্থে, সেই সংঘাতের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল আমার নিজের আচরণ।

কিন্তু এখানেই অনুসন্ধান থামিয়ে দিলে চলবে না। আমাকে আরও গভীরে গিয়ে জানতে হবে— “আমি কেন এমন আচরণ করলাম?” কারণ এই “কেন”-এর প্রকৃত কারণটি যদি আমি বুঝতে না পারি, তাহলে ভবিষ্যতেও একই পরিস্থিতিতে আমার রাগ আবার বিস্ফোরিত হতে পারে এবং আমি একই ধরনের পরিণতি ডেকে আনতে পারি।

সেই সময় আমার মনের অবস্থা যেন ছিল একটি

শক্ত করে পেঁচিয়ে রাখা স্প্রিংয়ের মতো।ভেতরে ভেতরে নেতিবাচক শক্তি জমা হচ্ছিল, আর সামান্য একটি ঘটনাই যেন সেই শক্তিকে এক মুহূর্তে বিস্ফোরিত করে দিল। তাহলে প্রশ্ন হলো—আমার ভেতরে এত তীব্র নেতিবাচক শক্তি জমে ছিল কেন?

এর কারণ কি শুধু সেই সময়কার পরিস্থিতি—অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ কাজে পৌঁছাতে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছিল? অনেকেই হয়তো তাই ভাববেন। কিন্তু একই যানজটে আটকে থাকা অন্য চালকদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন মানুষও ছিলেন, যাঁরা একইভাবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছিলেন, অথচ শান্ত ও স্থির ছিলেন। তাহলে শুধু বাহ্যিক পরিস্থিতি বা পরিবেশই আমার রাগের প্রধান কারণ হতে পারে না। আমাদের আরও গভীরে অনুসন্ধান করতে হবে।

দশস্বরূপতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সময় আমরা বুঝেছি যে, একজন মানুষ কী ধরনের কাজ করতে পারেন বা কোনো পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানোর প্রবণতা তাঁর মধ্যে রয়েছে—তার সঙ্গে তাঁর মনের প্রকৃতি গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাহলে সেই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থা কেমন ছিল?

আমি গুরুত্বপূর্ণ কাজে দেরি হয়ে যাওয়ার বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার মন ক্রোধে জ্বলছিল। আমি এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলাম, যা আমার নিজের শক্তি বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। অর্থাৎ, আমাকে নিজের অসহায়ত্ব ও সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

এই দিক থেকে দেখলে বলা যায়, আমার দ্রুত রেগে যাওয়ার প্রবণতাই সেই ঘটনার একটি কারণ ছিল। কিন্তু এখানেও অনুসন্ধান শেষ হয় না। আমাদের আরও একটি স্তর গভীরে যেতে হবে। আমাদের বর্তমান মানসিক অবস্থা অনেকাংশেই আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা গঠিত হয়।

আমাদের মনের "স্বতন্ত্র প্রকৃতি"-এর মধ্যে অতীতের কর্ম ও অভিজ্ঞতার প্রভাব বর্তমান পর্যন্ত এসে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ, অতীতের অভিজ্ঞতা যে ফল বা প্রভাব রেখে গেছে—"স্বতন্ত্র পরিনাম"—তা আমাদের মনের প্রকৃতি গঠনে ভূমিকা রাখে। তাই আমার নিজের ক্ষেত্রেও আমাকে ফিরে তাকিয়ে দেখতে হয়েছে—"আমি কি সত্যিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ার প্রবণতা নিয়ে বড় হয়েছি? আর যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তার পেছনে কারণ কী?"

ছোটবেলায় আমি প্রায়ই দেরি করতাম। বাড়ির কাজ বা বিদ্যালয়ের হোমওয়ার্কও অনেক সময় নির্ধারিত সময়ে জমা দিতে পারতাম না। এর জন্য বড়দের কাছ থেকে আমাকে কঠোরভাবে বকাঝকা শুনতে হতো। বাড়ি ও স্কুল—উভয় জায়গাতেই সময়মতো কাজ করা এবং সময় মেনে চলার জন্য আমার ওপর অনেক চাপ ছিল। এই অভিজ্ঞতাগুলো আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল—প্রায় এক ধরনের মানসিক আঘাতের মতো। তাই বিশের কোঠায় যখন আমি যানজটে আটকে পড়েছিলাম, তখন হয়তো আমার ভেতরে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা কাজ করছিল—"ছোটবেলায় সময়ের কারণে যে কষ্ট আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল, তা যেন আর কখনো ফিরে না আসে।"

এই আকাঙ্ক্ষা নিজে কোনো খারাপ বিষয় ছিল না। বরং এর মধ্যে ছিল নিজেকে রক্ষা করতে চাওয়ার একটি স্বাভাবিক ও কোমল অনুভূতি। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার সেই আকাঙ্ক্ষা ভয় ও ক্রোধের মতো অনুকূল নয় এমন আবেগে বিকৃত হয়ে গেল। আর সেই আবেগই আমাকে বাস্তবতাকে নিজের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করার জন্য উত্তেজিত আচরণের দিকে ঠেলে দিল।

এভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে, দুঃখ সমুদয় সত্যের অনুশীলন সবসময় সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন সময় নিয়ে সততার সঙ্গে নিজের অন্তরের দিকে তাকানো। নিজের অনুভূতি, চিন্তা, রাগ, ভয়, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিকে অস্বীকার না করে সেগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে সংঘের সহযাত্রীদের সঙ্গে নিজের অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা খোলাখুলি ভাগ করে নেওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কারণ কখনো কখনো অন্যের দৃষ্টিতে নিজের মনকে দেখলে আমরা এমন কিছু উপলব্ধি করতে পারি, যা একা নিজের পক্ষে দেখা কঠিন।

দুঃখকে সত্যিকার অর্থে অতিক্রম করতে হলে শুধু দুঃখকে অনুভব করছি—এখানেই থেমে গেলে চলবে না। আমাদের জানতে হবে—"এই দুঃখের পেছনে কী রয়েছে?" "আমি কেন এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখালাম?" "আমার মনের গভীরে কোন আকাঙ্ক্ষা, ভয় বা আসক্তি কাজ করছে?" অর্থাৎ, সমস্যার বাহ্যিক কারণের পেছনে না থেমে, ধীরে ধীরে তার মূল কারণের কাছে পৌঁছাতে হবে। এটাই দুঃখ সমুদয় সত্যের অনুশীলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ।

পরবর্তী পর্বে আমরা এই একই উদাহরণকে আবার সামনে রেখে আলোচনা করব—দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য "দুঃখ নিরোধের পথ" বা "মার্গ সত্য" কীভাবে অনুশীলন করা যায়। সেই অনুশীলনের পথ আমরা কীভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুঁজে নিতে পারি—আসুন, পরবর্তী পর্বে আমরা সবাই মিলে তা নিয়ে ভাবি।

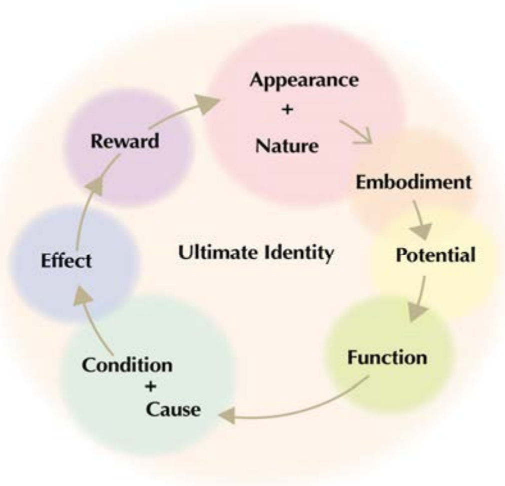

## সংঘের কার্যক্রমের প্রতিবেদন

রেভারেন্ড মারিয়া সাসাকি, মিনিষ্টার রিস্‌সো কোসেই-কাই ব্রাজিল

আমার এক ছেলে আছে, যে এখন কৈশোরে পা দিয়েছে। কিছুদিন আগে একদিন আমার খুব তাড়া ছিল। তাই আমি ছেলেকে বাড়ির একটি কাজে সাহায্য করতে বললাম। আমি বললাম, "বাবা, দয়া করে কাজটা এখনই একটু করে দাও।" কিন্তু তখন সে একটি ভিডিও গেমে গভীরভাবে মগ্ন ছিল।

সে বিরক্ত হয়ে বলল, "উফ্‌, আমি এখন তো এটা ছেড়ে উঠতে পারব না!" তার কথায় আমিও বিরক্ত হয়ে গেলাম। বলে ফেললাম, "সারাক্ষণ শুধু গেম খেলেই চলেছ!" এরপর কথায় কথায় আমাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল।

পরে শান্ত হয়ে যখন ঘটনাটি ফিরে দেখলাম, তখন নিজেকে প্রশ্ন করলাম—এই মা-ছেলের ঝগড়ার আসল কারণ কি সত্যিই আমার ছেলের আচরণ ছিল? আরও গভীরে নিজের মনের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারলাম, আসল কারণ ছিল—"সবকিছু আমার ইচ্ছামতো হোক", এই আমার নিজের মনের আঁকড়ে ধরা ভাব বা আসক্তি। আমি চাইছিলাম, ছেলে যেন সেই মুহূর্তেই আমার কাজে সাহায্য করে এবং আমার কথা অনুযায়ী কাজ করে। সেই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়াতেই আমার মধ্যে বিরক্তি ও রাগের জন্ম হয়েছিল।

এই উপলব্ধির পর আমার আরও একটি ঘটনা মনে পড়ল। এর কিছুদিন আগে আমার ছেলে তার প্রিয় একটি প্যান্ট ঠিক করে দিতে আমাকে বলেছিল। কিন্তু আমি সেই অনুরোধের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কয়েক দিন পর সে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, "মা, আমার প্যান্টটা কি ঠিক করে দিয়েছ?" তখন আমি বলেছিলাম, "আহা, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি দুঃখিত।"

এই ঘটনাটি মনে করে আমি নিজের আচরণের দিকে আরও গভীরভাবে তাকালাম। আমি তো চাইছিলাম, আমার ছেলে যেন আমাকে অবহেলা না করে। অথচ ছেলে যখন আমার কাছে একটি কাজের অনুরোধ করেছিল, তখন আমিই সেটি পরে করার জন্য ফেলে রেখেছিলাম। তাহলে, যে আচরণের জন্য আমি ছেলের ওপর রাগ করছিলাম, সেই একই ধরনের আচরণ কি আমি নিজেও করিনি? এই উপলব্ধির মাধ্যমে বুঝতে পারলাম—ছেলের আচরণ যেন আমার নিজের আচরণেরই প্রতিচ্ছবি ছিল।

আরও একটি বিষয় আমাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করল। আমার ছেলে প্রতিদিন বাড়ির নানা কাজে আমাকে সাহায্য করত এবং আমাকে সহযোগিতা করত। কিন্তু আমি ধীরে ধীরে সেই সাহায্যকে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত বিষয় হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম। তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অনুভূতিও যথেষ্ট ছিল না।

এই উপলব্ধির পর আমি নিজের আচরণ পরিবর্তন করার চেষ্টা শুরু করলাম। পরের বার কোনো কাজে ছেলের সাহায্য দরকার হলে আমি আর বলতাম না, "এখনই এটা করে দাও।" বরং বলতাম, "আমি তোমার একটু সাহায্য চাই। তোমার কোন সময়টা সুবিধাজনক হবে?" তখন আশ্চর্যজনকভাবে ছেলেও আর বিরক্ত না হয়ে সহযোগিতা করতে শুরু করল। আমিও আর সেই ছোট্ট ঘটনাকে মনে নিয়ে সারাদিন অস্বস্তি বা বিরক্তি বয়ে বেড়াতাম না।

এই অভিজ্ঞতা আমাকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখিয়েছে। আমরা যখন কোনো কষ্টদায়ক বা প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে, তার কারণ বাইরের মানুষ বা পরিস্থিতির মধ্যে খুঁজে, প্রথমে নিজের মনের দিকে তাকাতে হয়। আমার ছেলের সঙ্গে এই ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে আমি শরীরে-মনেই উপলব্ধি করতে পেরেছি—দুঃখের মূল কারণ, অর্থাৎ 'দুঃখ সমুদয় সত্য'-এর অনুশীলন মানে নিজের দুঃখের মূল কারণ হিসেবে নিজের 'আসক্তি'-কে চিনে নেওয়া।

বুদ্ধের আশীর্বাদে, এখন আমাদের বাড়িতে আগের তুলনায় অনেক বেশি প্রশান্তি বিরাজ করছে। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি আরও একবার উপলব্ধি করেছি—অন্যকে পরিবর্তন করার আগে নিজের মনকে সুশৃঙ্খল ও শান্ত করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

এভাবেই, আমার সামনে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, সেটিকে শুধু "সমস্যা" বা "বিরক্তিকর ঘটনা" হিসেবে না দেখে, বুদ্ধের কাছ থেকে পাওয়া নিজের মনকে পরিশুদ্ধ করার একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। প্রতিটি সম্পর্ক, প্রতিটি ঘটনা এবং প্রতিটি মুহূর্তকে সাধনার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে, নিজের অন্তরের বুদ্ধ-প্রকৃতি আরও বিকশিত করার জন্য প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে যেতে চাই।

# মৈত্রী-করুণা থেকে উৎপন্ন কঠোরতা

## কঠোর কথাও সরল মনে গ্রহন করা যায়

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্সো কোসেই-কাই।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, চিয়োদা ধর্মকেন্দ্র পরিদর্শন (ধর্মীয় সফর)

কঠোর উপদেশ যে গভীর করুণা থেকে উৎসারিত—এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যে বিষয়টি আমাদের মুগ্ধ করে, তা হলো "জল"-কে অবলম্বন করে উপদেশ প্রদানের সেই গভীর প্রজ্ঞা। জল স্বভাবতই নির্মল। তথাগত বুদ্ধ মানুষের অন্তর্নিহিত "বুদ্ধ-প্রকৃতি"-র সঙ্গে এই জলের তুলনা করে যেন বোঝাতে চেয়েছেন—"তোমার প্রকৃত স্বরূপও এই বিশুদ্ধ জলের ন্যায় পবিত্র ও নির্মল।"

রাহুল ছিলেন সরল ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী। তাই তিনি বুদ্ধের এই মর্মবাণীকে নিঃসংকোচে হৃদয়ে ধারণ করতে পেরেছিলেন এবং দ্রুতই সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হন।

এখানেই নিহিত রয়েছে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষাদানের এক গভীর রহস্য। কোনো ধর্মগ্রন্থেই দেখা যায় না যে তিনি কাউকে অবজ্ঞা করে বলেছেন—"তুমি অযোগ্য" বা "তুমি খারাপ মানুষ।" তিনি কখনোই মানুষের অন্তর্গত স্বরূপকে অস্বীকার করেননি। বরং উপদেশ প্রদানের সময় তিনি মানুষের মনোভাবের ভ্রান্তি ও আচরণের ভুলগুলোই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করতেন। মানুষ নিজেই যখন নিজের ভুল সম্পর্কে সচেতন থাকে, তখন সেই সত্য কথাকে সে সহজেই গ্রহণ করতে পারে। আর যখন হৃদয় উন্মুক্ত থাকে, তখন কঠোর বাণীও আর কঠোর বলে মনে হয় না—এটাই বুদ্ধের কঠোরতার প্রকৃত স্বরূপ। কর্মক্ষেত্র হোক কিংবা হোজায়—যারা কিছুটা

কঠোর ভাষায় কথা বলেন, তাদের প্রায়ই এড়িয়ে চলা হয়। কিন্তু যদি সেই কঠোরতা অন্যের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে স্বীকার করে, তার গুণাবলি ও সম্ভাবনাকে সম্মান জানিয়ে প্রকাশিত হয়, তবে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

অত্র সংস্থার সহপ্রতিষ্ঠাতা নাগানুমা মিয়োকো মহোদয়া প্রায়ই বলতেন, "এই মানুষটিকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতেই হবে।" এই মনোভাব থেকেই তিনি দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আচরণ—এমনকি খাওয়া-দাওয়ার শিষ্টাচার পর্যন্ত—সযত্নে নির্দেশ দিতেন। কেবল ধর্মচর্চার পদ্ধতিই নয়, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি ছিলেন সতর্ক পর্যবেক্ষক ও নিবেদিত পথপ্রদর্শক।

তাঁর এই কঠোর নির্দেশনার ফলেই বহু নেতা ও কর্মী নিজেদের আচরণ ও ব্যক্তিত্বকে সুসংহত করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত মহত্ত্ব ছিল এইখানে—প্রতিটি কঠোর বাক্যের অন্তরালে যে গভীর মমতা নিহিত, তা স্পষ্টভাবে অনুভূত হতো। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সূক্ষ্ম মনোযোগ দিতেন। মানুষ যখন অনুভব করে—কেউ সত্যিই তার কল্যাণ কামনা করছে, তখন সে তিরস্কারমূলক উপদেশকেও ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারে।

একজন পরিচিত ব্যক্তির অভিজ্ঞতাও এ কথাই প্রমাণ করে। কৈশোরে কোনো ভুল কাজ করায় তিনি তাঁর চাচার কাছে কঠোরভাবে তিরস্কৃত হন। তখন চাচা বলেছিলেন—"তুমি এত বুদ্ধিমান হয়ে এমন কাজ করলে কীভাবে?" এই একটি বাক্য তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে অনুরণিত হয়। তিরস্কারের জন্য বিরূপ হওয়ার পরিবর্তে, তিনি সেই চাচার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অনুভব করতে থাকেন। এমনকি আশি বছর বয়স অতিক্রম করার পরও তিনি বলেন—এই কথাই আজও তাঁর জীবনের প্রেরণা।

তবুও, আমাদের এই বাস্তব জগৎ—যেমন বুদ্ধ বলেছেন, "সবকিছুই দুঃখময়"—একটি কঠোর ও দুঃখপূর্ণ ক্ষেত্র। এই বাস্তবতায় দৃঢ়ভাবে বেঁচে থাকতে হলে, শৈশব থেকেই যথাযথ শিক্ষা ও শাসনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলা অপরিহার্য।

এই অর্থে বলা যায়—মানুষকে গড়ে তুলতে হলে মূলভিত্তি হতে হবে শতভাগ ভালোবাসা; কিন্তু সেই ভালোবাসাকে প্রয়োজনে দৃঢ় ও কঠোর ভাষার মাধ্যমেও প্রকাশ করা সমানভাবে জরুরি।

অতএব, আমাদের জীবনে যখনই কঠোর বাণী বা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তখন তার অন্তরালে নিহিত কল্যাণময় উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিত। কারণ, সেই কঠোরতার মধ্যেই অনেক সময় আমাদের উন্নতি ও প্রকৃত সুখের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে থাকে।

*নিওয়ানো নিক্কিও বাণী সংগ্রহ ১, 'বোধিবীজকে জাগ্রত করা' পৃ. ১০৫-১০৮।*

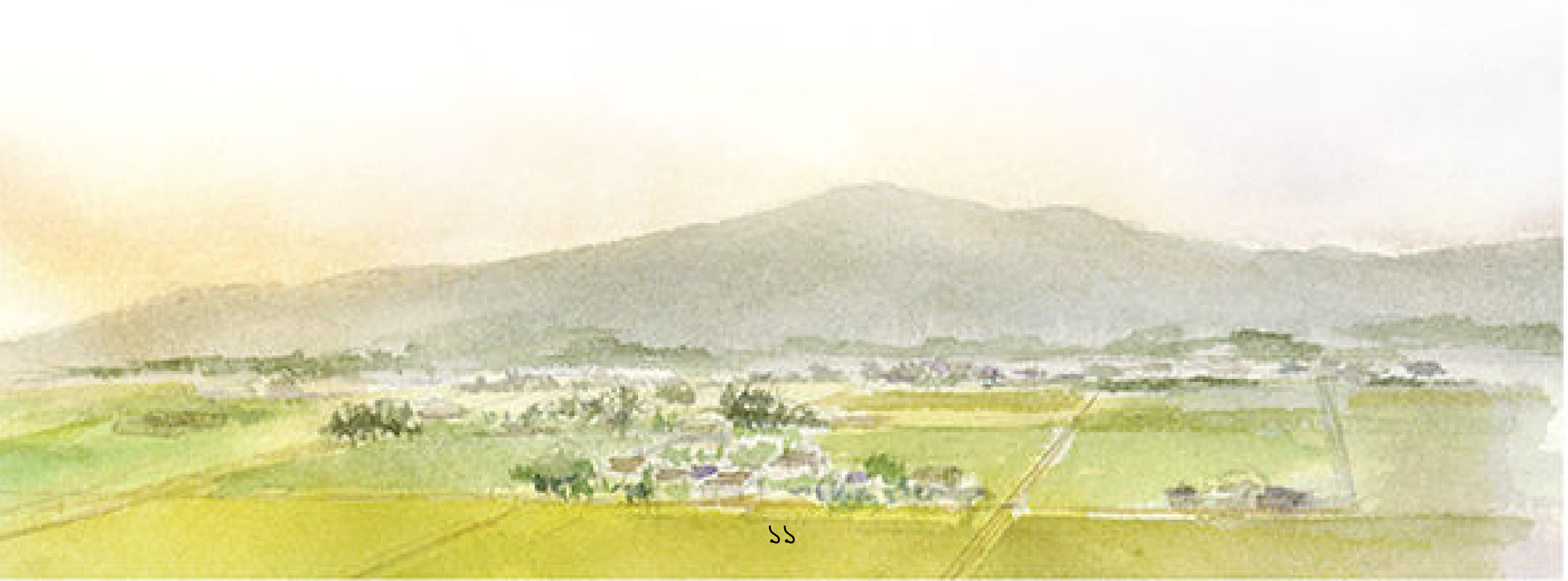

# সাক্ষাত থেকে শিক্ষা, সাক্ষাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা

রেভারেন্ড তাকাশি মায়েদা
পরিচালক, রিস্‌সো কোসেই-কাই আন্তর্জাতিক মিশন।

সবাইকে নমস্কার।

এই মাসে সম্মানিত প্রেসিডেন্টের ধর্মোপদেশের শিরোনাম হলো—"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি আনন্দিত।" আমরা যদি আমাদের পরিবার, বন্ধু, কর্মক্ষেত্রের সহকর্মী এবং সমাজের মানুষের সঙ্গে সবসময় এই অনুভূতি নিয়ে আচরণ করতে পারতাম, তাহলে আমাদের প্রতিদিনের জীবন কতই না উষ্ণ, আনন্দময় ও সুন্দর হয়ে উঠত!

আমাদের প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় শিক্ষা দিয়েছেন, "জীবন মানেই মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ।" অন্য মানুষের সঙ্গে আমাদের একের পর এক সাক্ষাতের মধ্য দিয়েই আমাদের জীবন গড়ে ওঠে। আর আমি বিশ্বাস করি, সেই প্রতিটি সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেরাও ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ ও পরিণত হয়ে উঠি।

আমরা প্রতিদিন অজান্তেই মানুষ ও পরিস্থিতিকে "পছন্দ-অপছন্দ" কিংবা "সঠিক-ভুল"-এর মতো মানদণ্ডে বিচার করে থাকি। কিন্তু যখন আমরা মনে করতে শুরু করি যে "শুধু আমার নিজের চিন্তাভাবনাই সঠিক," তখন বৌদ্ধধর্মে যাকে "আসক্তি" বলা হয়, সেই মনোভাব আমাদের মধ্যে জন্ম নেয়। এর ফলে, নিজের থেকে ভিন্ন মূল্যবোধের মানুষদের আমরা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করতে পারি। কিন্তু যাঁদের মূল্যবোধ আমাদের থেকে আলাদা, কিংবা যাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আমাদের কঠিন মনে হয়—তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎও কি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ "শেখার সুযোগ" নয়?

সম্মানিত প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ভিন্ন মতের মানুষের চিন্তাভাবনাকে তিনি এভাবে গ্রহণ করেছেন—"আচ্ছা, এমনভাবেও তো ভাবা যায়।" তাঁর এই মনোভাব থেকে আমি শিখেছি, মানুষের সঙ্গে প্রতিটি সাক্ষাৎকে যেমন আছে, তেমনভাবেই গ্রহণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বুদ্ধ মানুষকে পথ দেখানোর জন্য "তেত্রিশটি রূপে" আবির্ভূত হন। এর অর্থ এই হতে পারে যে, আমাদের সামনে আসা প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিটি সাক্ষাৎই আমাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনের সংকীর্ণতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার এক মূল্যবান সুযোগ।

তাই এই মাসেও, "আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি আনন্দিত"—এই কৃতজ্ঞতার মন নিয়ে জীবনের প্রতিটি সাক্ষাৎকে সযত্নে গ্রহণ করতে চাই এবং প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান করে প্রতিদিনের পথচলা অব্যাহত রাখতে চাই।

*২৮ জুলাই সংঘটিত ৭.১ মাত্রার কুমামোতো ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়, ইয়াতসুশিরো ধর্মকেন্দ্রের সদস্যারা এবং প্রধান কার্যালয় থেকে প্রেরিত সহায়তা দল ত্রাণ ও সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নেন। তাঁরা দুর্গত মানুষের কাছে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া, ধ্বংসাবশেষ অপসারণসহ বিভিন্ন সহায়তামূলক কাজে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিলেন।*

# Rissho Kosei-kai International

## Make Every Encounter Matter

## A Global Buddhist Movement

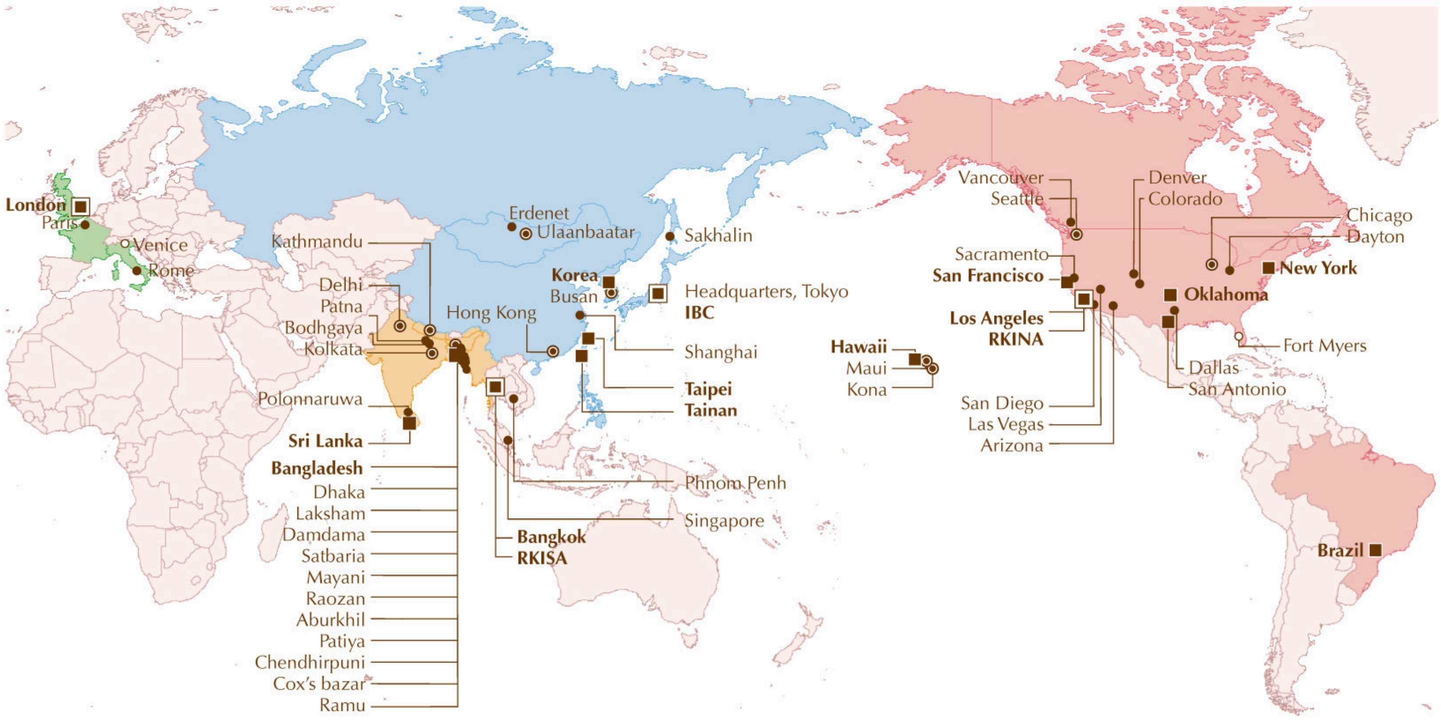


**Information about local Dharma centers**

**facebook**

**X**

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp